



Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)

A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture

Volume - v, Issue - iii, Published on July issue 2025, Page No. 151 - 159

Website: <https://tirj.org.in>, Mail ID: info@tirj.org.in

(SJIF) Impact Factor 7.998, e ISSN : 2583 - 0848

একালের সাহিত্যকারের দৃষ্টিতে যৌন বিপ্রতীপতার সূত্র সন্ধান :

আবুল বাশার ও তিলোত্তমা মজুমদারের দুটি উপন্যাস

ড. পিন্টু রায়চৌধুরী

সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

মুগবেড়িয়া গঙ্গাধর মহাবিদ্যালয়, পূর্ব মেদিনীপুর

Email ID : a.roy033@gmail.com

Received Date 25. 06. 2025

Selection Date 20. 07. 2025

Keyword

Anthropology,
Binary,
Sexuality,
Alienation,
Selfishness.

Abstract

A well-known theory in Levi Strauss's 'Structural Anthropology' is a reality in almost every one of our lives; That is the 'Binary Opposition Theory's are true; People have given it dignity or abandoned it according to themselves. On literature, the subject of 'sexuality' has been condemned and reviled in this way. Even though eternal love touched the heights of excellence of the book 'Shrikrishna Kirtan', this love did not get social recognition in real life. Joys and tears of the two hearts of lovers are as real as the eternal, one step further - the relationships of the third gender are equally real.

The formula for paradox is actually finding the relationship between two opposite characteristics. Thus in our present article we have chosen a female author as opposed to a male one. In two novels written by them – 'Chander Gaye Chand' (Tilottoma Majumder) and 'Naram Hridayer chinho' (Abul Bashar), we can find the perversity of sexuality in the selection of the story, traveling the spiral path of sexual desire. According to social norms of sexual relations, the intercourse will be only permitted who are married. But sexual relations can be between anybody. We want to show how true the complexity and complexity of these relationships are in the two novels we have analyzed. In addition, how much the journey of sexuality in the 21st century will be a call for future perspectives. Our discussion will capture the reflection of the hopes and disappointments, joys and tears, anger, sorrow, jealousy and love of the third gender. The difference between the simple life of the common man and the third gender is complex but true. In this article, we will try to uncover the truth of the life of the third gender based on the principle of paradox.

Discussion

পাশ্চাত্য নৃতত্ত্ববাদ লেভি স্ট্রাসের 'Structural Anthropology' গ্রন্থের অন্তর্গত একটি সুবিখ্যাত তত্ত্বের কথা আমাদের প্রায় প্রত্যেকের জীবনেই বাস্তবসত্য। সেই তত্ত্বটির নাম 'Binary Opposition Theory' বা জোড়ায় জোড়ায় বৈপরীত্য,



যা সত্য হলেও মানুষ নিজেদের মতো করে একে মর্যাদা দিয়েছে অথবা পরিত্যাজ্য করেছে। এই বৈপরীত্য বা বিপরীত বৈশিষ্ট্য যে-কোনও পদার্থের অবয়বে বিরাজমান থেকে তাকে পূর্ণতা দান করে। জীবনে ও সাহিত্যের দরবারে ‘যৌনতা’-র প্রসঙ্গটি চিরকাল এভাবেই নন্দিত ও নিন্দিত হয়। ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তন’ গ্রন্থের তত্ত্বশ্রী পরকীয়া প্রেম পাঠকের হৃদয়মূলে শ্রেষ্ঠত্বের শিখর স্পর্শ করলেও বাস্তব জীবনে এই প্রেমের সামাজিক স্বীকৃতি ঘটেনি। প্রেমাতুর দুটি হৃদয়ের কান্না-হাসির হলাহল মন্ত্রনে স্বকীয়ার মতোই পরকীয়া সত্যি, আরও একধাপ এগিয়ে বলা যায় — তৃতীয় লিঙ্গের সম্পর্কগুলিও সত্যি।

বিপ্রতীপতার সূত্র আসলে বিপরীত দুটি বৈশিষ্ট্যের মধ্যে সম্পর্ক সন্ধান করা। যেমন— সাদা x কালো, পৃথিবী x স্বর্গ, মেয়ে x ছেলে, পাপ x পুণ্য ইত্যাদি।^১ এভাবেই আমাদের বর্তমান নিবন্ধে আমরা চয়ন করেছি একজন পুরুষ লেখকের বিপরীতে আরেকজন নারী লেখককে। তাঁদের রচিত দুটি উপন্যাসে— ‘চাঁদের গায়ে চাঁদ’ এবং ‘নরম হৃদয়ের চিহ্ন’ কাহিনির বিষয়বস্তু নির্বাচনে, যৌন আকাঙ্ক্ষার সর্পিলাপথ পরিভ্রমণ করতে করতে যৌনতার বিপ্রতীপতাকে খুঁজে পাবো আমরা। সমাজ স্বীকৃতি যৌন সম্পর্কের সূত্র অনুযায়ী সঙ্গমবাসনা কেবলমাত্র বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ একজন নারী ও পুরুষের মধ্যেই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু যৌনসম্পর্ক যদি একজন নারীর সঙ্গে নারীর বা পুরুষের সঙ্গে পুরুষের মধ্যে হয়; তাহলে তা অবাঞ্ছিত বলে ধরা হয়। আমাদের বিশ্লেষিত দুটি উপন্যাসে এই প্রকার অবাঞ্ছিত সম্পর্কের জটিলতা ও বিপ্রতীপতার কতিপয় সূত্র নির্মাণে উদ্যত হয়েছি আমরা। পাশাপাশি বর্তমানের বদলে যাওয়া সময়ে তথা একুশ শতকে যৌনতার যাত্রাপথ কতটা ভবিষ্যৎ সমাজের দিশারী, তা দেখানোর চেষ্টা করেছি।

তৃতীয় লিঙ্গের সমস্যা ও সংকটকে চিহ্নিত করতে হলে সবার প্রথমে আমাদের এই সম্পর্কিত ধারণার অভিযুক্তিকে চিহ্নিত করতে হয়। তৃতীয় লিঙ্গ বলার অর্থ প্রথম ও দ্বিতীয় লিঙ্গকে স্বীকার করে নেওয়া। আমরা এই ধারণার বাইরে গিয়ে, স্বীকৃতির বিপরীতে অস্বীকারের অবস্থানটি চিহ্নিত করতে চাই। ব্যাপারটা অনেকটা এইরকম, প্রথম ও দ্বিতীয় লিঙ্গ হল নারী ও পুরুষ।

নারীর বিপরীতে পুরুষ (Fxm), পুরুষের বিপরীতে নারী (MxF) -

নারী ও পুরুষ বিপরীতধর্মী শারীরিক ও মানসিক বৈশিষ্ট্যযুক্ত বলেই তারা একত্র সহবাস যোগ্য। এক্ষেত্রে বায়োলজিক্যালি তাদের সেক্স আইডেন্টিটি এবং জেন্ডার আইডেন্টিটিকে সত্য বলে গণ্য করা হয়। আসলে স্ত্রী-অঙ্গ বা পুরুষাঙ্গ থাকা প্রাকৃতিক এবং বায়োলজিক্যাল ব্যাপার। কিন্তু স্ত্রী-অঙ্গ থাকলেই কাউকে শাড়ি পরতে হবে, চুরি পরতে হবে, এই ভাবনা সমাজের তৈরি। এটাই হল জেন্ডার আইডেন্টিটি। অধিকাংশ ক্ষেত্রে বায়োলজিক্যাল পরিচয়কে কাজে লাগিয়ে সোশ্যাল আইডেন্টিটি নির্ধারণ করা হয়। তাই সমাজের অন্তর্গত সকল নারী পুরুষকে বলা হয় সিস জেন্ডার। আর যারা সেইটা করে না, ট্রান্সফরমেশন করে, তারা ট্রান্স জেন্ডার। তৃতীয় লিঙ্গের আসল পরিচয় এই সমাজ নির্ধারিত জেন্ডার বিভাজনকে ভেঙে বেরিয়ে আসার প্রচেষ্টা করে।^২ ট্রান্স উইম্যান পুরুষের বায়োলজিক্যাল আইডেন্টিটি নিয়ে জন্মালেও স্বেচ্ছায় নারীর সামাজিক আইডেন্টিটি গ্রহণ করে। ট্রান্স ম্যানের বিষয়টি এর উল্টো, অর্থাৎ নারীর শরীর নিয়ে জন্মেও তারা পুরুষের সামাজিক আইডেন্টিটি গ্রহণ করে। বাংলায় আমরা যাদেরকে সাধারণত রূপান্তরকামী নারী বা পুরুষ বলে থাকি। যারা ‘সেক্সচ্যুয়াল রিএসাইনমেন্ট সার্জারি’ (SRS) করে হরমোন ট্রিটমেন্ট করে পুরোপুরি নিজেদের জেনেটিক্যাল অঙ্গগুলিকে প্রতিস্থাপন করে বা অপসারণ করে, তখন তাদের আমরা ট্রান্সসেকচুয়াল উইম্যান বা ম্যান বলি। বাংলায় বলে রূপান্তরিত নারী বা পুরুষ। বিজ্ঞান অনুযায়ী মিয়োসিস কোষ বিভাজন পদ্ধতি দ্বারা নারীর ক্রোমোজম XX, অন্যদিকে পুরুষের ক্রোমোজম XY, একে অপরকে নিষিক্ত করলেও, সর্বদা একটি পূর্ণাঙ্গ লিঙ্গ বৈশিষ্ট্যযুক্ত নারী বা পুরুষের জন্ম নাও দিতে পারে। সেক্ষেত্রে নিষিক্ত ক্রোমোজোম কোষ বিপরীত বৈশিষ্ট্যযুক্ত শিশুর জন্ম দেয়। এই ক্ষেত্রে ক্রোমোজোমের বিন্যাস হয়, XXX (ট্রাইসোমি এক্স) অথবা XXY (ক্লাইনফেল্টার সিনড্রোম) অথবা XYY (জ্যাকব সিনড্রোম)।^৩ এই শিশু জন্মানোর প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ প্রকৃতি নির্ভর এবং বিজ্ঞানসম্মত বিষয়। গর্ভবতী অবস্থায় নির্দিষ্ট সময়ের পরে ভ্রূণের অবস্থান জেনে তাকে ধ্বংস করে দেওয়ার প্রচেষ্টা আইন বিরুদ্ধ। যেকোনো শিশুর পৃথিবীতে বেঁচে থাকার অধিকার আছে অথচ লিঙ্গ বৈশিষ্ট্য কিংবা জেন্ডার পরিচয়ে কোনও প্রকার বিচ্যুতি থাকলেই আমরা সেটাকে অপরাধ বলে মনে করি। সেই কারণে যৌন বিচ্যুতি (Sexual Disorders)



লক্ষণযুক্ত শিশুকে আমরা নানাভাবে বিব্রত করে তার সুস্থ জীবন-যাপনে বাধার সৃষ্টি করি। পরিণতি স্বরূপ সেই শিশুকে কখনও সমকামী বা রূপান্তরকামী বলে সন্দেহজনক ব্যবহার করে থাকি, তাদেরকে আমরা হিজড়ে বলে সম্বোধন করি। কিন্তু একবারও বিচার করি না সেই শিশুটির যৌন সংকট তার ক্ষেত্রে কতখানি স্বাভাবিকভাবে বেঁচে থাকার অন্তরায় হয়ে উঠতে পারে।

তৃতীয় লিঙ্গ অথবা দ্বিতীয় লিঙ্গের মূল লড়াইটা কিন্তু প্রথম লিঙ্গের সঙ্গে। এই ভাবধারা থেকে মুক্তির একমাত্র উপায় বোঝাপড়ার স্বচ্ছতা। সেই কারণে আমাদের আসল সত্যকে মেনে নিয়েই জীবনের পথ চলতে হবে। সেক্ষেত্রে একটি পরিচয় এবং যৌনতা তার অন্তর্গত পরিচালক জীবনী শক্তি। যৌনতার ব্যবহার মনুষ্য জীবনে অপার শান্তি আনে; তেমনই নিজের কাছ থেকে নিজের জীবনকে কেড়েও নিতে পারে যৌনতা। ভারতবর্ষে অথবা বিদেশে সর্বত্রই সাহিত্য, শাস্ত্র, ভাস্কর্য ও চিত্রকলায় অকপটে যৌনতার কথা বলা হয়েছে। যৌনতার অসংখ্য পরিচয় ও মুদ্রা আবিষ্কৃত হলেও সমাজ বিবর্তনের সঙ্গে মানুষের যৌন চরিত্রের বদল ঘটে চলেছে। আমাদের আলোচনার সুবিধার্থে কয়েক প্রকার যৌন বিপ্রতীপতার সূত্র এখানে উল্লেখ করলাম —

সূত্র ১. বাহ্যিক প্রকাশ নারীসুলভ, দেহের মধ্যে স্তন ও নিত্য সুশোভিত একই সঙ্গে বাহুযুগল রোমশ, নারীর প্রতি ভোগাকাঙ্ক্ষা প্রবল। **female sex < male sex = Homo sexuality.**

সূত্র ২. নারী সত্ত্বা প্রবল, হৃদয় নরম শান্ত আনন্দ পাওয়ার জন্য সদা চঞ্চল উল্টোদিকে পুরুষের প্রতি অবিশ্বাস, সাংসারিক প্রয়োজনে কাম বিমুখতা। **female sex × real life struggle × sex struggle = Homo feeling without sex.**

সূত্র ৩. পুরুষের পরিচয় অঙ্গে ধারণ করেও নারী বৈশিষ্ট্যগুলিকে অনুকরণ করা, নিজের ব্যক্তি পরিচয়কে না বোঝা ছেলের সংখ্যা সমাজে কম নয়। বর্তমানে চলতি ভাষায় এদেরকে ‘গে’ বলা হয়। এইসব ছেলেদের মধ্যে মেয়েলিপনা অত্যধিক মাত্রায় বিরাজমান থাকে। **male sex < female sex = sexual anxiety.**

সূত্র ৪. নারীর পরিচয় অঙ্গে ধারণ করেও সামাজিক চাপের বশবর্তী হয়ে নিজেকে পুরুষ বলে প্রতিপন্ন করতে থাকে অনেকেই। বহু ক্ষেত্রে নারীর ক্লিটোরাস নামক যৌন অঙ্গটি ৬-৭ ইঞ্চি লম্বা আকার ধারণ করে অনেকটা পুরুষাঙ্গের মতো বাইরে বেরিয়ে থাকে। খালি চোখে যাকে পুরুষের শিল্প মনে হলেও ডাক্তারি পরীক্ষায় প্রমাণ করা সম্ভব ওটা প্রকৃতিগত বিপ্রতীকতা। **female sex organ x male sex organ = sexual confusion.**

সূত্র ৫. সম্পূর্ণভাবে সুস্থ একজন প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ বিশুদ্ধ নারী লিঙ্গের প্রতি প্রবল যৌন আকর্ষণ বোধ করে। আবার সমলিঙ্গ হিজড়ের সঙ্গেও যৌন সম্পর্ক স্থাপন করে। **hetero sexuality + homo sexuality = sex satisfy.**

সূত্র ৬. ছেলেদের মধ্যে মেয়ের রূপ ধারণ করার প্রবল ইচ্ছে থেকে রূপান্তরকামী নতুন মানুষ জন্মগ্রহণ করে শল্য চিকিৎসার মাধ্যমে। তারপর সে নিজের জন্য জীবনসঙ্গী চয়ন করে। একদিন তাদের সঙ্গীরাও ছেড়ে চলে যায়। **female type < female life x pregnancy crisis = sex crisis.**

সূত্র ৭. নারীর প্রেম ভাবনায় একবার আঘাত লাগার পর অনেকেই নতুন করে আর বিয়ে করে ঘর বাঁধতে চায় না। কিন্তু বিষমকামী যৌন আকাঙ্ক্ষা নিবারণের উদ্দেশ্যে পুরুষসঙ্গী নির্বাচন করে একসঙ্গে থাকে। **female sex x male sex = sex without love.**

আমাদের উপরিবর্ণিত যৌনতার বিপ্রতীপ সূত্রগুলি নির্বাচিত রচনাকারের দুটি উপন্যাসে বিস্তৃত স্থান লাভ করেছে। তৃতীয় লিঙ্গ বা LGBT-দের নিয়ে বাংলা সাহিত্যের চর্চা অবশ্য অনেক আগে থেকেই প্রচলিত ছিল। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত ‘হাসুলী বাঁকের উপকথা’ উপন্যাসে নসুবালা চরিত্রটি থেকে ২০১৫ খ্রিস্টাব্দে স্বপ্নময় চক্রবর্তীর বিখ্যাত উপন্যাস ‘হলদে গোলাপ’-র পরী, সকলেই সমাজ নির্ধারিত লিঙ্গ রাজনীতির ফসল। কথায় বলে ‘বজ্র আঁটুনি ফস্কা গেরো’। ভারতবর্ষে যৌন স্বাধীনতার বজ্র আঁটুনি বহু ক্ষেত্রে মানবাধিকার লঙ্ঘনকেই ত্বরান্বিত করেছে। ইউরোপের নেদারল্যান্ডসে ১৮১১ খ্রিস্টাব্দ থেকে ডেনমার্ক ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দ, সুইজারল্যান্ড ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দ, ফিনল্যান্ড ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দ, অস্ট্রিয়া ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দ, বেলজিয়াম সর্বত্র ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে সমকামীতা স্বীকৃত। আমেরিকার কানাডায়, দক্ষিণ

আফ্রিকায়, অস্ট্রেলিয়ায় ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দে এমনকি নেপাল ২০০৭, পাকিস্তান ২০০৯, বাংলাদেশ ২০১৩ খ্রিস্টাব্দে LGBT Sex আইন স্বীকৃত করলেও ভারতে তা সুনিশ্চিত হয় ২০১৮ খ্রিস্টাব্দে। কিন্তু সমলিঙ্গ বিবাহের বিষয়টি সুপ্রিম কোর্ট নাকচ করে দেয় ২০২৩ খ্রিস্টাব্দে। যৌন বাসনা মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি তাকে আইন বলবৎ দ্বারা প্রতিহত করা সম্ভব নয়। LGBT -দের অধিকার রক্ষায় ভারতবর্ষকে আরও বেশি সচেতন হতে হবে। বাংলা কথাসাহিত্যের কয়েকটি অসামান্য কাহিনি এই একই বিষয়কে সমর্থন করে। সমগ্র বিশ্বের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দ থেকে বাংলা সাহিত্যিকারগণ এই বিষয়ে ক্রমাগত লিখে চলেছেন। সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি রচনা হল—

‘শেষ নমস্কার শ্রীচরণেশু মাকে’ (১৯৭১) সন্তোষ কুমার ঘোষ, ‘মায়ামৃদঙ্গ’ (১৯৭২) সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, ‘পৌরুষ’ (১৯৮৪) কবিতা সিংহ, ‘রূপমঞ্জুরি’ (১৯৯০) নারায়ণ সান্যাল, ‘ব্রহ্ম ভার্গব পুরাণ’ (১৯৯৩) কমল চক্রবর্তী, ‘সন্তাপ’ (১৯৯৩) মানব চক্রবর্তী, ‘বামাবোধিনী’ (১৯৯৭), ‘অভিজ্ঞান’ (২০০৯) নবনীতা দেবসেন, ‘নরম হৃদয়ের চিহ্ন’ (২০০১) আবুল বাশার, ‘রমণীরতন’ (২০১৫) শীর্ষ বন্দ্যোপাধ্যায়।

আমাদের মূল আলোচনা যেহেতু তিলোত্তমা মজুমদারের ‘চাঁদের গায়ে চাঁদ’ এবং আবুল বাশারের ‘নরম হৃদয়ের চিহ্ন’ এই দুটি উপন্যাস; তাই বিশ্লেষিত যৌন বিপ্রতীপতার সূত্রগুলিকে আমরা এই উপন্যাসের অভ্যন্তরেই সীমাবদ্ধ রাখব। তার আগে যৌনতার প্রাচীনতা সম্পর্কে দু-চার কথা বলা যাক। পাশ্চাত্যে ট্রয় যুদ্ধের মতোই ভারতবর্ষে সীতাকে অথবা মহাভারতে দ্রৌপদীকে কেন্দ্র করে যুদ্ধ এবং হত্যালীলা সংঘটিত হয়েছিল। প্যারিস, রোম বা ভ্যাটিকান সিটি ভ্রমণের সময় রাস্তার দুদিকে মৈথুনরত নগ্ন নর-নারীর ভাস্কর্য পরিলক্ষিত হয়। ঠিক একই রকমভাবে ভারতবর্ষের পুরী, কোনারক, খাজুরাহো মন্দিরে মিথুনলিঙ্গ নগ্ন নর-নারীর প্রতিকৃতি ও যৌন মুদ্রার দৃশ্য চাক্ষুষ করা যায়। প্রাচীন চিত্রকলায় যেমন মাইকেল এঞ্জেলো, পাবলো পিকাসোর ছবিতে যৌনতা রয়েছে; তেমনি বাংসায়নের কামসূত্রে, কালিদাসের মেঘদূত কিংবা কুমারসম্ভব কাব্যে রয়েছে যৌনতার ছড়াছড়ি। প্রাচীনকালের শিল্প সাহিত্য বাদ দিয়ে হাল আমলের বাংলা সাহিত্যে আদি লগ্ন থেকেই যৌনতার বাড়াবাড়ি লক্ষ করা যায়। আসলে মানবজীবনে যৌনতার অবদান খুবই জরুরী, কারণ এরই মধ্যে দিয়ে প্রকৃতিগতভাবে সৃষ্টিশীলতার ধারা বহমান থাকে। কিন্তু আমাদের সমাজে যৌন চাহিদা বা সৃষ্টিশীলতার পাশাপাশি যৌন অবদমন প্রক্রিয়াটিও ভীষণভাবে সক্রিয়। যৌনতার এমনই এক অচ্ছুৎ ও অবদমিত অধ্যায়ের নাম সমকামীতা। আজ একুশ শতকের তৃতীয় দশকে এসেও সমকামীতার প্রসঙ্গে বিরুদ্ধাচরণ করে থাকেন জনগণ। তাদের অনেকের কাছে এই ব্যাপারটি এখনও প্রকৃতি বিরুদ্ধ, অশ্লীল ও কুরুচিপূর্ণ। LGBT ছাত্র ছাত্রীদের উচ্চতর পঠন-পাঠনে লিঙ্গ থাকতে হলে রাষ্ট্রকে আরও বড় ভূমিকা পালন করতে হবে। পাশ্চাত্যের মতো ভারতেও উন্নত মানের বিশ্ববিদ্যালয়ে LGBT Study Course চালু না হলে, যথার্থ পরিবর্তন আসবে না। পরিণাম হেতু সমকামীদের ক্ষতিকর পদার্থ ভেবে নানান কুরুচিকর মন্তব্যের দ্বারা বিব্রত করা, এমনকি তাদের মৃত্যুর পথে ঠেলে দেওয়াও অতি স্বাভাবিক ব্যাপার বলেই গণ্য করা হবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় বহু দেশে তৃতীয় লিঙ্গ বিষয়ক উচ্চতর পাঠ্যক্রম চালু রয়েছে। ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে নেদারল্যান্ডসে ‘Gay and Lesbian Study’ পড়ানো হয়। ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দ থেকে এই বিষয়টি গবেষণা ও উচ্চতর ডিগ্রির জন্য ছাড়পত্র পায়। এরপর ক্যালিফোর্নিয়ায়, আমেরিকার এম. আই. টি-তে, ডিউক এবং টরেন্টো ইউনিভার্সিটিতে LGBT study ডিগ্রি কোর্স ও গবেষণা পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত হয়। সমকামীতা এখন সর্বজনবিদিত মানবিক চর্চার বিষয়।

একুশ শতকের খ্যাতনামা নারী লেখক তিলোত্তমা মজুমদার। তাঁর রচনায় প্রকৃতি স্বমহিমায় বিরাজমান। প্রকৃতির স্বাভাবিকতা তার সৌন্দর্যরূপ ও রূদ্ররূপ; উভয়ের মধ্যে সমানভাবে বিরাজমান। প্রকৃতির সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সহাবস্থানে মানুষও তাদের স্বাভাবিক প্রবৃত্তিগুলি নিয়েই বেঁচে থাকে। মানুষের মধ্যেও প্রকৃতির লক্ষণগুলিকে খুঁজে দেখেন তিলোত্তমা মজুমদার। তার এই দেখায় কোন খাদ নেই বলে জীবনের সঙ্গে যৌনতার অবিরাম পথ চলা আবিস্কার করেন লেখক।

‘চাঁদের গায়ে চাঁদ’ (২০০৩) উপন্যাসটি আসলে কয়েকজন একত্র সহাবস্থানকারী নারীর উপাখ্যান। এই সমস্ত নারীরা বাংলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে পড়াশোনার লক্ষ্যে অথবা নিজের জীবনে প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে বাড়ির ঘেরাটোপ ছেড়ে হোস্টেলে থাকতে আসে। হোস্টেলের অনেক মেয়ের মাঝে বিশেষভাবে নজর কেড়ে নেয় তেতলায় রুম নাশ্বার কুড়িতে

থাকা চারজন মেয়ে। শ্রুতি বসু, শ্রেয়সী আচার্য, বনা মিশ্র, আর দেবরূপা। মেস বাড়িতে এই চারজনকে নিয়ে কাহিনির জাল বুনন করবার সময়; লেখক নারীর ভূমিকাকে প্রকৃতির সঙ্গে মিশিয়ে দেখেছেন নিরবিচ্ছিন্ন আদিমতার ভূমিকায়—

“এই দেহ এক অলীক, এক রহস্য ভাবনাও যেন। এবং সমস্ত রহস্যগুলি বয়ঃসন্ধিকালে চলে যায় জনন ভূমিকায়। চলে যায় যৌনতায়। এবং যৌনতা সম্বন্ধীয় এই বোধ যদি ঈশ্বরের তৈরি হয় বা প্রকৃতির তবে তা অত্যন্ত সচেতন নির্মাণ কারণ যৌনতার মধ্যে সৃষ্টিবীজ। যৌনতায় সৃষ্টি রহস্য। তোমরা জানো, সঙ্গম ও রতিক্রিয়ার প্রবণতার তলায় আছে স্বপ্রকাশ। আত্মপ্রকাশ।”^৫

তাত্ত্বিক লেখক হিসেবে তিলোত্তমা মজুমদার নারী জীবনের সামাজিক সাংসারিক দায়বদ্ধতার ঊর্ধ্বে ঊঠতে সক্ষম হয়েছেন। নারী চরিত্রের বায়োলজিক্যাল কনসেপ্ট পরিষ্কার করে ব্যাখ্যা করার সঙ্গে সঙ্গে পুরুষ চরিত্রের পারস্পরিক যৌন পরিচয়ের কথাও তিনি বলেছেন—

“নারীর যোনিতে আছে নিমফি, বা লিবিয়া মাইনরা। নিমফির ভাঁজ দুটি ওপর দিকের যে জায়গায় মিশেছে তার নাম ক্লাইটোরিস, বহু স্নায়ুর মিলনস্থল, এই অংশটি তীব্র যৌন অনুভূতির কেন্দ্র। শাস্ত্রে বলে, পুরুষের লিঙ্গের সঙ্গে এই অংশটি চরিত্রে মেলে। কেন-না জ্রণ অবস্থায় যে-অংশ ধীরে ধীরে পুরুষ শিশুর বেলায় লিঙ্গ হয়ে দেখা যায়, সেই অংশ থেকেই মেয়েদের ক্লাইটোরিস গড়ে ওঠে। ক্লাইটোরিস বা ক্লিটোরিস, যাই বলো, যৌনতায় এর অনন্য ভূমিকা লক্ষ্য হয়।”^৬

দেবরূপার মধ্যে নারীর প্রতি ভোগাকাজ্ঞা প্রবল। পূর্বক্লেখিত ১ সংখ্যক সূত্র অনুযায়ী বলা হয়েছে, female sex < male sex = Homo sexuality. এর অর্থ কিছুটা জটিল হলেও তিলোত্তমা মজুমদার বাংলা পাঠকের দরবারে মেয়েদের কথা বেশ পরিষ্কার ভাবেই তুলে ধরেছেন। মেসের ২০ নম্বর ঘরে বনা যখন প্রথম দিন রুমমেট হয়ে প্রবেশ করে তখন দেবরূপা তাকে দেখে বলে, ‘মালটা কী পড়ে?’ এই কথা শুনে শ্রুতি প্রায় অবাক হয়ে যায়, দেবরূপার মুখের ভাষায় ছেলেদের অবিকল উক্তি তাকে আচমকিতে স্তম্ভিত করে দেয়। এই একই কথা প্রত্যক্ষভাবে মেসের এক বছর সিনিয়র দিদি দেবস্মিতা বলেছিল শ্রুতিকে। তখনই প্রতি জানতে পারে তাদের রুমমেট দেবরূপা বয়িশ গোছের, অর্থাৎ ওর মধ্যে একটা ছেলে ছেলে ব্যাপার আছে। দেবস্মিতাই প্রথম দেবরূপার সম্পর্কে বলেছিল—

“ও লেসবিয়ান। তাদের সবকটাকে সিডিউস করে দেবে।”^৭

দেবরূপার আচরণে স্পষ্টতই নারী শরীরের প্রতি আকর্ষণ ধরা পড়েছিল বলে হোস্টেলের সকল মেয়েরা নালিশ করেছিল। বনাও শ্রুতিকে বোঝানোর চেষ্টা করেছিল কিন্তু শ্রুতি বিশ্বাস করেনি। অবশেষে বনা রুম ছেড়ে চলে যায়, কারণ দেবরূপার সঙ্গে শ্রেয়সীর সম্পর্কটা দৃষ্টিকটু হয়ে ওঠে। দেবরূপার বনগাঁর বাড়িতে বেড়াতে যাওয়ার সময় শ্রুতি দেখে দেবরূপার দাদা দেবমাল্য আর তার ছোট ভাই দেবাংশুকে। তাকে দেখে যেন মেয়ে বলে মনে হল। যেন এক উলটপুরাণ, দেবরূপা মেয়েরূপী ছেলে আর দেবাংশু ছেলেরূপী মেয়ে। দেবরূপার স্বভাবে পুরুষদের প্রতি প্রবল বিরক্তি বোধ ছিল। শ্রেয়সীর শরীর দেবরূপা ভোগ করত, তাই শ্রেয়সীর প্রেমিক শুভ্রশীল কিংবা তার নিজের দাদা দেবমাল্যের সঙ্গে কথা বলায় শ্রেয়সীকে নিরন্তর ভৎসনা করত। শ্রেয়সীকে চাপ দিত বিয়ে না করার জন্য। তার এই মানসিকতায় সমকামী মনোভাব ফুটিয়ে তুলেছেন লেখক।

২নং সূত্র অনুযায়ী আমরা দেখি শ্রুতি বসুকে, যার মধ্যে প্রবল এক নরম হৃদয় মানবসত্তা বিরাজমান। সে সর্বদাই শান্ত, আনন্দ পাওয়ার জন্য সদা চঞ্চল হলেও প্রকাশের ক্ষেত্রে মিতভাষী। প্রেমে অগাধ বিশ্বাস থাকলেও সাংসারিক প্রয়োজনে কাম বিমুখতাকেই নিজের জীবনের লক্ষ্য করে নেয় শ্রুতি। তার চরিত্রের মধ্যে আমরা লক্ষ্য করি— female sex x real life struggle x sex struggle = Homo feeling without sex. শ্রুতির থেকে বয়সে ছোট ভাই অলক (ওলু) মানসিকভাবে অসুস্থ। শ্রুতি উচ্চমাধ্যমিক পাশের আগেই তার মায়ের মৃত্যু ঘটায় বাবাও ভীষণ ভেঙে পড়ে। ভাই ও বাবার সম্পূর্ণ দায়িত্ব শ্রুতিকেই পালন করতে হয়। একমাত্র ভাই শ্রুতির প্রাণস্বরূপ, তাকে ছেড়ে সে কোথাও যেতে পারবে বলে ভাবতেই পারে না। কিন্তু বাবার অনুরোধে তাকে কলেজে দর্শন পড়ার জন্য শহরে আসতে হয়। প্রথম কয়েকদিন দূর

সম্পর্কীয় পিসির কাছে থাকার পর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হোস্টেলে আসে শ্রুতি। প্রথম প্রথম রুমে মন না বসলেও শ্রেয়সীকে দেখে মুগ্ধ হয়ে যায়। মনে মনে তাকে ভালো লাগতে থাকে শ্রুতির—

“পরিবারের বাইরে এই সে প্রথম। এবং পারিবারিক সম্পর্কের বাইরে এই তার প্রথম কোনও টান। কেন সে জানে না। শ্রেয়সী নয় বলে অন্য কেউ নয় কেন তাও সে জানে না। সে জানেনি শ্রেয়সী কেমন, কী তার পরিবার। সে ভাবেনি শ্রেয়সী নারী না পুরুষ। প্রথম দর্শনে সে শ্রেয়সীকে প্রিয় করেছিল এবং একই রুমে আছে দেখে অপূর্ব সম্পর্ক প্রত্যাশা করেছিল।”^৮

শ্রেয়সী-দেবরূপার সমকামী সম্পর্কের কথা শুনে শ্রুতির মন খারাপ হয়। আসলে শ্রেয়সীর মধ্যে যে অপরূপ সৌন্দর্য সে দেখেছিল তা কখনোই প্রকাশ করতে পারেনি। কারণ, শ্রুতি ছিল চাপা স্বভাবের নারী। নিজের জীবনের অস্থিরতা তাকে আরও কুণ্ঠিত করে রাখত। তবুও শ্রেয়সীর কষ্ট দেখলেই শ্রুতির মনে হাহাকার তৈরি হত। একবার শ্রেয়সীর প্রেমিক তাকে চুমু খেয়ে গলায় দাগ করে দিলে তার উদ্ভিগ্নতা দেখে শ্রুতি ভাবে—

“কী সুন্দর ছিল ও। কী নিটোল ছিল যেদিন প্রথম আসে। কে ওর সৌন্দর্যহরণ? কে ওর লালিত্যচোর? শ্রেয়সী বদলে গিয়েছে একরকম। সৌন্দর্য শোষণ করে রেখে গেছে কিছু হাড়মাস। তবু কী সুন্দর দুই চোখ। নাক। কী সুন্দর ঠোঁট। অপূর্ব ঠোঁট আর অপূর্ব গড়ন। মায়া হল। মায়া হল শ্রুতির।”^৯

রানা মুখোপাধ্যায় নামে একজন অচেনা মানুষ শ্রুতিকে প্রেম পত্র লেখে, কিন্তু তাকে শ্রুতি পাগলের প্রলাপ ভাবে, আবার মনে মনে অনুভব করে কে হতে পারে এমন মানুষ—

“লোকটা পাগল যে এই অদ্ভুত চিঠিগুলো লেখে। আর আমি উন্মাদ যে এই চিঠি পড়ি ও জমিয়ে রাখি।”^{১০}

শ্রুতির জীবনে নারী হৃদয়ের সমস্ত কামনা বাসনা পারিবারিক সংকট ও দোলাচলতায় মনের গভীর খাতে বিলুপ্ত হয়ে যায়। এই উপন্যাসের দ্বিতীয় পর্বে সামান্য মাইনের চাকরিতে এন.জি.ও-তে যোগ দিয়ে বস্তির বাচ্চাদের দেখাশোনা করে শ্রুতি। জীবনের অপূর্ণ প্রেমাকাজক্ষা, একমাত্র ভাইয়ের দুরবস্থা, শ্রেয়সীর সান্নিধ্য সবকিছু ভুলে গিয়ে বস্তির শিশুদের জন্য সঞ্চারিত হয় শ্রুতির নরম হৃদয়ের স্পর্শ। নিয়তির পরিহাসে একদিন তাদের এন.জি.ও তে চাকরি করতে আসে দেবরূপা। সেখানে আচমকিতে একজন মেয়েরূপী ছেলেমানুষ ললিত অসুস্থ অবস্থায় থাকতে এলে সকাম দেবরূপা তার সঙ্গে যৌনক্রিয়া করে। নিষ্কাম শ্রুতির এই দৃশ্য দেখে মনে হয় ওরা যেন রাধা আর কৃষ্ণ। বস্তির অশিষ্ট চঞ্চল বালক সুকুমার শ্রুতিকে বলে—

“আন্টি তুমি কিছু বললে না কেন? আন্টি ওরা কী করছিল?”

আমি বললাম- ওরা রাধা-কৃষ্ণ খেলছে সুকুমার। কিন্তু কে রাধা আর কে কৃষ্ণ! আজ কৃষ্ণ রাধা সেজেছে আর রাধা কেউটি সেজে মজা করছে।

আমি জানি, সুকুমার বুঝবে না, ওরা শরীর-প্রকৃতি ছাপিয়ে গেছে। মন-প্রকৃতিতে মিলেছে। চিরন্তন নারীমন চিরন্তন পুরুষমনে মিলেছে। দেহ-গঠন এখানে বাধা হয়নি। নারীদেহধারী পুরুষ, পুরুষদেহী নারীকে জড়িয়েছে। জয় প্রকৃতির জয়!”^{১১}

দেবরূপাদের বনগাঁর বাড়িতে বেড়াতে যাওয়ার পরে দেবরূপার একটি ভাই রয়েছে দেবাংশু, তার আচার আচরন পুরোপুরি মেয়েদের মতো—

“শ্রুতি দেখছে। আশ্চর্য দেখছে। পুরুষালি দেবরূপার মেয়েলি ছোটভাই।... দেবাংশু, পাজামা-গেঞ্জি পরা, কাজল চোখে, গালে ওর নতুন দাড়ি-গোঁফ পরিপূর্ণ, চুলগুলি বড়র দিকে, কাঁধে এসে থেমে গেছে। এবারে একাদশ শ্রেণী ওর। স্বর বাঁক নিচ্ছে যৌন পরিণতির দিকে। তবু ওর মেয়েলিপনা। তবু ওর কথায় টান। কথায় সুর। অকারণ। অর্থহীন। একটি তরুণীই সে যেন-বা একজন, কোমলা বালিকা। অন্তঃস্থ বসে আছে এক পুরুষ শরীরে।”^{১২}

দেবাংশু পুরুষ হলেও তার শরীরবৃত্তীয় পুরুষালী স্বভাবগুলিকে অবগুণ্ঠনে রেখে তাকে দেবরূপা মেয়েলি স্বভাবের করে তুলেছে। নিজেকে নিয়ে দেবাংশু সংশয় হয়, শ্রুতির সামনে সেই সংশয়ের প্রতিচ্ছবি ধরা পড়ে—

“শ্রুতি লক্ষ করেছিল, দেবাংশু তার চেয়ে প্রায় ছ’ ইঞ্চি বেশি লম্বা। ওর গালে নতুন দাড়ি সুকোমল।
ওর স্বর ভেঙে ভেঙে ঘটাচ্ছে যৌনবিকাশ। তবু, দেবাংশু অপূর্ণ হয়ে আছে। মানসিক অপূর্ণতা। মানসিক
বিকাশের পরিপন্থী রূপ। শ্রুতি, দেবাংশুকে, ওলুৎ এমন জড়িয়েছিল। দেবাংশু বলেছিল-শ্রুতিদিদি।
আমাকে কী ভাবো তুমি? আমি কে হই তোমার?”^{১৩}

এখানে স্পষ্টতই দেবাংশুর মধ্যে একটা ব্যক্তি পরিচয়ের সংকট তৈরি হয়েছে। তার মধ্যে পুরুষালী যৌনবোধ কম বলেই,
মেয়েলি স্বভাবের বাড়াবাড়ি লক্ষ করা যায়। শ্রুতিও খুব সহজেই দেবাংশুর পাশাপাশি রাতে এক বিছানায় শুয়ে পড়তে
পারে। আমাদের পূর্ব-উল্লেখিত তৃতীয় সূত্র অনুযায়ী, male sex < female sex = sexual anxiety-র তত্ত্বটি এক্ষেত্রে খুব
ভালো ভাবে প্রয়োগ করে দেখালেন লেখক।

আবুল বাশার রচিত ‘নরম হৃদয়ের চিহ্ন’ উপন্যাসের কাহিনি যে তিনজন প্রধান চরিত্রকে কেন্দ্র করে, তাদের
মধ্যে একজন হল মরমী। বিত্তবান ব্যবসায়ী পরিবারের একমাত্র ছেলে। অথচ তার ছেলে পরিচয়টাই সঠিক বায়োলজিক্যাল
পরিচয় নয়। কারণ, মরমী নামটির মতোই বিপরীতধর্মী জেন্ডার আইডেন্টিটি এই চরিত্রের ব্যক্তি সংকটকে চিহ্নিত করে
দেয়। মরমীকে সকলে ছেলে বলে জানলেও তার চেহারার সৌন্দর্য ও স্তনের আকৃতি সম্পূর্ণ মেয়েলি খাঁচের। কলেজে তার
বন্ধু অরিন্দ্র মরমীকে একলা পেয়ে শারীরিক উপভোগের জন্য কাম পীড়িত হয়ে উঠেছিল—

“আচমকা পাশ থেকে ডান দিকের বুকটা চেপে ধরে বলল, ভেরি সুইট মরমী, একদম মেয়েদের মতো।

কী করে হয়েছে রে। বলে চেপেই ধরে রইল।”^{১৪}

বহু কষ্টে অরিন্দ্রের চোখে আঙুল চুকিয়ে দিয়ে মরমী কলেজ থেকে ছুটে পালাবার জন্য একটা ট্যাক্সি ধরেছিল। সেই সময়
ট্যাক্সি ড্রাইভারও তার উদ্যত বুক এবং মেয়েলি মুখ দেখে তাকে ভোগ করতে চেয়েছিল। বৃষ্টির মধ্যে ট্যাক্সি থামিয়ে মরমীর
প্রতি বর্বর আচরণ করার সময় মরমী সেখান থেকে ছুটে পালিয়েছিল। বহু কষ্টে নিজেকে বাঁচিয়ে প্রচণ্ড বৃষ্টিতে ভিজে ভয়ে
এবং হতাশায় বাড়ির সামনে গিয়ে মরমী অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল। বাধ্য হয়ে তাদের বাড়ির ভাড়াটে ডাক্তার কুন্দনরক্তিম
মুখার্জী মরমীকে ধরে ওপরে নিয়ে যায় এবং তার জামা কাপড় খুলিয়ে দেওয়ার সময় অনুভব করে—

“মরমীর পা মেয়েদের মতোই কোমল এবং রক্তাভ। অল্প অল্প রোম হয়েছে। বালকদের মতো অতি
সামান্য রোম ঠোঁটের উপর, যা অনেক সুন্দরী মেয়েরই হয়ে থাকে। সারা মুখে স্নিগ্ধ কমণীয়তার মধ্যে
সুগু কষ্ট লেগে আছে। এমন ছাঁদের অদ্ভুত সুন্দর কিশোরমুখ কোথাও দেখিনি কুন্দনরক্তিম। সবচেয়ে
বিস্ময়কর বুকের অমন নারীবৈশিষ্ট্য। রক্তিম বারবার হতবিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে পড়ছে।”^{১৫}

ডাক্তারবাবুর সঙ্গে মরমীর প্রথম সাক্ষাতেই কুন্দন নিশ্চিত হয়েছিল এই ছেলে লক্ষণ অনুযায়ী আসলে একজন নারী। গল্পের
কাহিনি এগোতেই আমরা জানতে পারি মরমীর ঠিক মেয়েদের মত ঋতুস্রাব শুরু হয়। ঘটনার আকস্মিকতায় মরমী ভয়
পেয়ে উদ্ভট কুন্দনের কাছে যাওয়ার পরে ডাক্তারবাবু তার রক্ত পরীক্ষা করেন এবং ক্লিটোরাসের অবস্থান দেখে সুনিশ্চিত
হয়ে যান যে আর যাই হোক মরমী ছেলে হতে পারে না। নিশ্চিত হওয়ার জন্য কেরিওটাইপ পরীক্ষা করার কথা মরমীকে
বলে। ঠিক সেই সময়ে মরমী নিজের অস্তিত্বের সংকটে প্রায় উন্মাদের মতো বলতে থাকে—

“আমি কে? কী আমি? কেমন আমি? বলুন আমাকে। চুপ করে থাকবেন না। আমার গলায় পৈতে আছে
ডাক্তারবাবু। আমি কে তা হলে?”^{১৬}

মরমী চরিত্রটিকে লেখক ডাক্তারি বিদ্যার অনুযায়ী অঙ্কন করে পাঠকের কাছে এই বার্তাটুকু রাখতে চেয়েছেন যে,
প্রকৃতিগতভাবে যৌনবৈচিত্র্য কোনও অস্বাভাবিক ব্যাপার হতে পারে না। কারণ ডাক্তার কুন্দনরক্তিম মুখার্জীর কথায়, কোনও
মেল কমপ্লিটলি মেল নয়, কোন ফিমেল কমপ্লিটলি ফিমেল নয়। মরমী চরিত্রটির বিশ্লেষণ যথাযথভাবে ৪ নং সূত্রের সঙ্গে
সায়ুজ্যপূর্ণ। যথা, female sex organ x male sex organ = sexual confusion.

‘নরম হৃদয়ের চিহ্ন’ উপন্যাসে অন্যতম চরিত্র মানিনী ও তার স্বামী হৃদয়নাথ দুজনেই কলেজের অধ্যাপক। কিন্তু
তাদের যৌন জীবন অতৃপ্ত। মানিনীর স্তনের আকৃতি ছোট বলে হৃদয়নাথ তাকে অবহেলা করায় বয়স্ক কাকার কাছে স্ত্রী
গমন করে। সক্রিয় আক্ষেপের সঙ্গে হৃদয় তার বন্ধুর কাছে বলে—

“মানী সারারাত আমার ঘরে ছিল না। বারবার স্নেহকার কাছে গেছে। আমার ভাল লাগেনি। স্নেহকারা খুব একটা ভাল লোক না। নীচে মালিয়াকে দেখলে? কাকার বন্ধু। মালিয়া আসলে পুরুষ। মনে মনে মেয়ে। মেন্টালি ফিমেল, বাট জেনেটিক্যালি হি ইজ মেল। কাকা মালিয়াকে নিয়ে কী করতে চাইছে, আমার জানা নেই।”^{১৭}

এই স্নেহকারা চরিত্রটি অদ্ভুতভাবে নিজের যৌন চাহিদা নিবারণের উদ্দেশ্যে খাঁটি নারী মানিনীর সঙ্গে এবং নারী বেশি পুরুষ হিজড়ের সঙ্গে একত্র সঙ্গম করে। স্নেহকারার উক্তি—

“আমি নারী-পুরুষ একসঙ্গে মেলাতে পারি। মানিনী আর মালিয়া।”^{১৮}

স্নেহকারার মধ্যে যৌন সম্পর্ক স্থাপনের কোনও ধরা বাধা নিয়ম নেই। অর্থাৎ ৫ নং সূত্র অনুযায়ী hetero sex + homo sex = sex satisfy এই চরিত্রের সবচেয়ে বড় বিষয়।

স্নেহকারা অর্থাৎ স্নেহাংশু কীর্তনীয়া মানুষটির যে হিজড়ে বন্ধু ছিল সে আসলে তার পুরনো সঙ্গী, নাম মালিয়া। মালিয়া পুরুষ থেকে সম্পূর্ণভাবে নারী হতে চায় তাই সে ডক্টর কুন্দনের কাছে আসে, অন্যদিকে মরমীর বাবা চায় তার বকের স্তন অপারেশন করে তাকে সম্পূর্ণ ছেলেতে পরিণত করতে। ডাক্তারের চেম্বারেই একদিন উভয়ের দেখা হয়ে গেলে স্নেহকারার সম্পর্কে মালিয়া মরমীকে বলে— ‘আমার মোগা। আমার হবু বর। বয়স্ফেণ্ড।’

এছাড়া আরও বলে—

“আরে ভাই, আমরাও তো মানুষ। তুমি মেয়ে; ছেলে সেজে বসে আছো আর আমি হলাম ছেলে; মেয়ে সেজে রয়েছি। তুমি বড়লোক, আমি গরিব।”^{১৯}

মালিয়া ও মরমী দুজনেই কুন্দনের পেশেন্ট, মালিয়া চায় নিজের চেহারার রূপান্তর করে একজন পরিপূর্ণ নারী হয়ে উঠতে। এখানে রূপান্তরকারী জেন্ডার পরিচয়ে সংকটের প্রতিচ্ছবি ধরা পড়ে। ৬ নং সূত্র অনুযায়ী – female type < female life + pregnancy crisis = sex crisis একেবারে সত্যি হয়ে ওঠে।

এই উপন্যাসের সবথেকে আকর্ষণীয় চরিত্র মানিনী নারীত্বের সর্বোচ্চ আবেদন নিয়েও অপূর্ণ, কারণ তার স্বামীর চোখে তার স্তন্যুগল ছোট। স্বামীর সঙ্গে সহবাস করার পরেও জীবন সম্পর্কে ঘৃণা ছাড়া আর কিছুই না পেয়ে সে হৃদয়নাথের উদ্দেশ্যে বলে—

“তুমি আমাকে মণিকার মতো ব্যবহার করবে। দরকার হলে তাইই করেছ। অন্ধকারে প্রথম রাতেই তুমি আমার শুচিতা হরন করেছ। তারপর আলোয় এই দেহ দেখোনি আর। ধর্ষিতার আর শুচিতা কীসের। আমি আজ সব পারি। খুকু বাঁচতে পারিনি। কিন্তু আমি বাঁচব।”^{২০}

বাঁচার তাগিদ নাকি দেহের খিদে; তা না বুঝেই স্বামীর কাকার সঙ্গে কাম ক্রিয়ায় লিপ্ত হয় অধ্যাপিকা মানিনী। দেহের আকর্ষণে কাকাকে বিয়ে পর্যন্ত করতে চেয়ে একসঙ্গে লিভ ইন করে। তার কলেজের কলিগ দেবিকার অবিবাহিত যৌন সম্পর্ক দেখে প্রথমে ঘৃণা করলেও পরে নিজেই সেই পথ অবলম্বন করে মানিনী—

“যার জীবনকে একদিন সহ্য করতে পারিনি মানিনী। শেষে তার চেয়েও এক মারাত্মক সহবাস করছে সে। দেবিকা এখন নিশ্চয় মনে মনে হাসে। আবার খুশিও হয়েছে। দু’খানা আলাদা পাশাপাশি ঘর দিয়েছে, দু’টোরই ভাড়া দিতে হয় মানিনীকে। যৌনতার জন্য দেহ লাগে। আমার তা ছিল না। মস্ত একটা মনের গর্ব করতাম। দেহ না থাকলেই কি মানুষ মনের বশে থাকে? কী হল দ্যাখ! এই ক্ষুদ্র দেহই কত রহস্যময়। দেবিকার চেয়ে কম তো নয়ই, এ যেন আরও চতুর। কী আছে এই দেহের ভিতরে? দেখা তো গেল না কখনও। রূপ-রূপান্তরেও নিজেকে চেনা গেল না।”^{২১} ৯৭০

পূর্বে উল্লেখিত ৭নং সূত্র অনুযায়ী— female sex × male sex = sex without love. মানিনী চরিত্রে যেমন সত্য তেমনি স্নেহাংশু কীর্তনীয়া চরিত্রটির মধ্যেও সমান সত্য।

মানিনী, মরমী ও মালিয়া এই উপন্যাসের তিনজন চরিত্র। এদের মধ্যে সহবাস-কাম, সমকাম ও রূপান্তরকারীর বিচিত্র টানা পোড়নে ‘নরম হৃদয়ের চিহ্ন’ উপন্যাসের বীজ বপন করেছেন লেখক। যৌন চাহিদার ক্ষেত্রে মনের কত প্রকার

আকাঙ্ক্ষা ও বিকৃতি মানুষের জীবনকে পরিচালিত করে, তার যথার্থ দলিল হয়ে উঠেছে এই উপন্যাস। সামগ্রিকভাবে বলা যায়, তৃতীয় লিঙ্গের সংকট ও সমস্যাগুলি আমাদের আলোচিত দুটি উপন্যাসে প্রকৃতিগত সত্যরূপে যৌন বিপ্রতীপতাকে সুচিহ্নিত করে।

Reference:

১. রায়চৌধুরী, পিন্টু, কালের দর্পণে বাংলা প্রবন্ধ, কলকাতা, সাহিত্যসঙ্গী, ২০১৫, পৃ. ১৪
২. তদেব, পৃ. ১৫
৩. রায়, অভিজিৎ, সমকামিতা, ঢাকা, ইস্টিশন, ২০১০, পৃ. ৩৭
৪. তদেব, পৃ. ৩৭
৫. মজুমদার, তিলোত্তমা, চাঁদের গায়ে চাঁদ, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ২০২৩, পৃ. ৫২
৬. তদেব, পৃ. ৫৩
৭. তদেব, পৃ. ৮৫
৮. তদেব, পৃ. ৯০
৯. তদেব, পৃ. ১৩০
১০. তদেব, পৃ. ২১৯
১১. তদেব, পৃ. ২২৭
১২. তদেব, পৃ. ১০৫
১৩. তদেব, পৃ. ১০৮
১৪. বাশার, আবুল, দশটি উপন্যাস, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ২০২২, পৃ. ৮৯৮
১৫. তদেব, পৃ. ৯০৬
১৬. তদেব, পৃ. ৯১২
১৭. তদেব, পৃ. ৯১৫
১৮. তদেব, পৃ. ৯৫০
১৯. তদেব, পৃ. ৯৫৬
২০. তদেব, পৃ. ৯৪৮
২১. তদেব, পৃ. ৯৭০

Bibliography:

- রায়, অভিজিৎ, সমকামিতা, ঢাকা, ইস্টিশন, ২০১০
- মজুমদার অজয় ও বসু নিলয়, ভারতের হিজড়ে সমাজ, কলকাতা, দীপ প্রকাশন, ২০১১
- চক্রবর্তী অরিন্দম, দেহ গেহ বন্ধুত্ব: ছটি শারীরিক তর্ক, কলকাতা, অনুষ্টুপ, ২০১১
- দাশগুপ্ত, কৃষ্ণপ্রিয়, যৌনতার আক্ষরিক অনুষ্ণ, কলকাতা, কুবোপাখি, ২০১৬
- নন্দী, ধীরেন্দ্রনাথ, মনের বিকার ও প্রতিকার, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ২০০১
- দেবসেন, নবনীতা, ভালোবাসার বারান্দা (২য় খণ্ড), কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ২০১৫
- বন্দ্যোপাধ্যায় মানবী, বাংলা সমাজ ও সাহিত্যে তৃতীয় সত্তা চিহ্ন, কলকাতা, প্রতিভাস, ২০১২